শ্রী শ্রী দুর্গার কাঠামো : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

ড. মধুসূদন কৃষ্ণ দাস

মা দুর্গার কাঠামোয় আটটি মূর্তি রয়েছে। মাঝখানে রয়েছেন মা দুর্গা। তাঁর ডানদিকে লক্ষ্মী এবং গণেশ। বামে সরস্বতী এবং কার্তিক। চরণতলে সিংহ। সম্মুখে বামদিকে অসুর। বাম প্রান্তে কলাবৌ তথা নবপত্রিকা। এই আটটি মূর্তি নিয়ে মা দুর্গার কাঠামো। এই সম্পর্কে নীচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১. শ্রী শ্রী দুর্গা
স্কন্দপুরাণ অনুসারে রুরু নামক এক দৈত্যের পুত্র দুর্গম নামক এক অসুরকে বধ করায় দেবীর নাম হয়েছে দুর্গা। আবার মার্কন্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রী শ্রী চন্ডীতে দেবী নিজ মুখেই বলেছেন: দুর্গম নামক এক অসুরকে বিনাশ করে আমি দুর্গাদেবী নামে প্রসিদ্ধা হব। দুর্গা শব্দ-এর অর্থ হল দুর্জ্ঞেয় - তাই তিনি দুর্গা।

আবার কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত নারায়ণ উপনিষদে দুর্গা শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এজন্য বলা যায় দুর্গা শব্দটি বেশ প্রাচীন - এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সন্তানের জন্য মা সবসময়ই অসুরের সাথে যুদ্ধ করছেন। আর যুদ্ধের জন্য মায়ের হাতে রয়েছে অস্ত্র-শস্ত্র। দশ হাতে মায়ের দশটি অস্ত্র। ডান দিকের পাঁচ হাতের অস্ত্রসমূহ (উপর থেকে নীচের দিকে):
ত্রিশুল, খড়্গ, চক্র, তীক্ষবাণ ও শক্তি। বামদিকের পাঁচ হাতে অস্ত্রগুলো হল: খেটক (ঢাল), ধনুক, পাশ, অঙ্কুশ এবং ঘন্টা বা কুঠার।

উপরোক্ত প্রতিটি অস্ত্রের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য রয়েছে -
(i). প্রথমতঃ ত্রিশুল জীবের স্থল। সুক্ষ্ম এবং কারণ দেহ নির্দেশ করে। তিনি এই তিন দেহ বিলীন করে দিয়ে জীবকে তার সিদ্ধ দেহে উজ্জীবিত করে দেন।

আবার আর এক মতে ত্রিশুল এর তিনটি তীক্ষ্ণ ফলক দ্বারা আধ্যাত্মিক, আদিদৈবিক এবং আদিভৌতিক - জীবকে এই তিন ক্লেশের হাত থেকে রক্ষা করেন।

(ii). দ্বিতীয়তঃ দুর্গামা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীমায় দাড়িয়ে আছেন। মায়ের বা-চরণ, কটি এবং গ্রীবা সামান্য বাঁকা (বঙ্কিম)। তিনি ডান-চরণ রেখেছেন সিংহের পিঠে সরলভাবে। বাম-চরণের অঙ্গুষ্ঠ (বৃদ্ধাঙ্গুলি) রেখেছেন অসুরের কাঁধে / স্কন্দে বা বুকের উপর।

(iii). তৃতীয়ত, খড়্গ হলো তত্ত্বজ্ঞানের অসি (তলোয়ার)। এর দ্বারা তিনি তার ভক্তের বা সাধকের অজ্ঞানতা নাশ করেন।

(iv). চতুর্থত, পাশ-অস্ত্র দ্বারা তিনি তার ভক্তকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে বেধে আলোর তথা জ্ঞানের পথে নিয়ে আসেন।

(v). পঞ্চমতঃ চক্র হল বিষ্ণুর অস্ত্র। মা এই অস্ত্রের সাহায্যে তাঁর ভক্তকে সবধরণের বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন।

(vi). ষষ্ঠতঃ অঙ্কুশ দ্বারা তিনি জীবের হৃত-জ্ঞানকে জাগ্রত করে তোলেন।

এভাবে প্রতিটি অস্ত্রের ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক তাৎপর্য্য আছে।

মা দুর্গা সকল বস্তুতেই মাতৃরূপে বিরাজিতা আছেন - তিনিই বিশ্বজননী। ব্রহ্মাণীরূপে তিনি সৃষ্টি করেন। বৈষ্ণবী শক্তিরূপে ইনি জীবকে পালন করেন। আবার শিবাণীরূপে তিনিই সবকিছু বিনাশ করেন।

মা দুর্গা নিখিল জগতের দেবগণের শক্তিসমূহের প্রতীক। তাঁর মধ্যেই সর্বজগতের সব রশ্মি নিহিত।

এতবড় শক্তিশালিনী হয়েও মা দুর্গা স্নেহময়ী এবং করুণাময়ী - করুণার সাগর। ভক্তের চোখে মায়ের নয়ন থেকে সর্বদাই করুণা নির্গত হচ্ছে। যুদ্ধে যখন তিনি ভীষণ রূপিণী তখনও তাঁর করুণা নিঃশেষ হয়না। এই মহাকারুণ্যই নিখিল বিশ্বে তাঁর মাতৃত্বের উৎস।

২. শ্রী শ্রী লক্ষ্মী
শ্রী লক্ষ্মী হলেন নারায়ণের গৃহিণী। একসময় ঋষি দুর্বাসা ইন্দ্রকে অভিশাপ দেন তিনি লক্ষ্মীচ্যুত হবেন। শাপের কারণে লক্ষ্মীদেবী সাগরে প্রবেশ করেন। দেবতা ও অসুরদের সমুদ্র মন্থনের ফলে তিনি আবার সমুদ্র থেকে বের হয়ে আসেন। তিঁনি ধনাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

লক্ষ্মী সর্বজীবের জীবিকার উৎস। তিনি স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী রূপে, রাজার গৃহে রাজলক্ষ্মী রূপে, যাদের জীবন পবিত্র তাদের সংসারে গৃহলক্ষ্মীরূপে পরিচিতা।

লক্ষ্মী নামেরও একাধিক তাৎপর্য্য আছে। যেমন টাকা পয়সা ও ধন। আবার চরিত্র ধনও মহাধন। যার টাকা নেই সে লক্ষ্মীহীন বলে সমাজে পরিচিত হয়। যার চরিত্র ধন নেই তাকেও লক্ষ্মীহীন বলে। আবার যারা সাধক তাঁদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল মুক্তিধন। যারা লক্ষ্মীনারায়ণের ভজনা করেন তাদের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হল মুক্তিধন, ইত্যাদি।

লক্ষ্মীদেবীর বাহন পেঁচক বা পেঁচা। এখন প্রশ্ন হল লক্ষ্মীদেবী এত সুন্দরী অথচ তাঁর বাহন এমন কদাকার। পেঁচক মূলত নিশাচরী - অর্থাৎ কেবলমাত্র রাতেই বের হয় এবং চলাফেরা করে। দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে। তেমনি এই জড়জগতে অতি ধনশালী হলেই অনেক লোকই স্বার্থপর হয়ে যায়। ধনী হওয়ার আগে ভাবে, ধন হলে সবার উপকার করব। আত্মীয়স্বজনদের আর দুঃখ-কষ্টে থাকতে দেব না। কিন্তু ধনাঢ্য হলেই তার স্বভাব পেঁচকের মত হয়ে যায়।

লক্ষ্মীমান (ধনাঢ্য) হয়েও চক্ষুষ্মান্ (বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন) এমন মানুষ কি নেই? আছে। লক্ষ্মীর বাহন পেঁচক তাদের প্রতি উপদেশ দেয়: তুমি দিনের আলোয় রয়েছ। তাই তুমিই আসল ভাগ্যবান। আর যারা ধনাঢ্য হয়ে সবধরণের কুকাজ করে, কুপ্রবৃত্তি দ্বারা পদে পদে চালিত তারা আমার মতই অন্ধকার জগতের জীব হয়ে যায়। তাই হীন পথে ধন উপার্জন কর না। পবিত্র - অর্থাৎ সৎপথে থেকে ধন উপার্জন কর। আর পবিত্র কাজে ধন ব্যয় কর।

যারা প্রকৃত পক্ষে মুক্তি পথের পথিক লক্ষ্মীর বাহন পেঁচক তাদেরকে গীতার বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন -
মা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগতি সংযমী।
যস্যাংজাগ্রতি ভূতানি মা নিশা পশ্যতোমুনেঃ।।
(গীতা ২/৬৯)

পেঁচক মুক্তিকামী জীবকে বলছে: সবাই যখন ঘুমায় তখন তুমি আমার মত জেগে থাক। আর সবাই যখন জেগে থাকে তখন তুমি আমার মত ঘুমোতে শেখো। তাহলেই তোমার সব বিষয়ে সিদ্ধি হবে।

৩. শ্রী শ্রী গণেশ
গণেশ ঠাকুর হলেন শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী শ্রী বিষ্ণুর অংশ। এক সময় পুত্রলাভের জন্য শিবের অনুরোধে পার্ব্বতী শ্রী বিষ্ণুর আরাধনা করেন। শ্রী বিষ্ণুরও ইচ্ছা ছিল জগৎ জননীর পুত্ররূপে আবির্ভুত হওয়া। তাই পুরাকালে পার্ব্বতীর পুত্ররূপে তিনি আসেন। এই কথা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রয়েছে।

শনির দৃষ্টিতে একসময় গণেশের মাথা চ্যুত হয়। এই অবস্থায় ইন্দ্রের হাতি ঐরাবতের মাথা কেটে নিয়ে আসা হয় এবং তা গণেশের শিরে লাগানো হয়। গণেশকে সর্বকাজের সিদ্ধিদাতা বলা হয়। এজন্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায় খুব যত্ন সহকারে গণেশের পূজা এবং আরাধনা করে। এক অর্থে তাঁকে গণদেবতাও বলা হয়।

এত বড় শরীর অথচ তাঁর বাহন অতি ক্ষুদ্র এক মূষিক / ইঁদুর। এখানে বড় এবং ক্ষুদ্রের মধ্যে মহামিলনের ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায়। তবে ইঁদুর যত ছোটই হোক না কেন সে কিন্তু হাতির স্বজাতি। কারণ প্রথমত দুই জনই পশুজাতি। তাছাড়া উভয়ের কান (কর্ণ) একই রকম দেখতে। দুইজনের চারখানা পা আছে। এথেকে গণেশদেব আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে স্বজাতির যত দোষই হোক, তাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়।

এখন প্রশ্ন হল এতটুকু মূষিক / ইঁদুর কি এত বড় গণেশকে বহন করতে পারে? নিশ্চয়ই পারে। এই বাহন সমাজের বহমান দিক তুলে ধরে। কেননা ক্ষুদ্ররাই কিন্তু মূলত সমাজকে বহন করে চলেছে। ক্ষুদ্র বলতে এখানে আমজনতা বোঝায়।

আগেই বলা হয়েছে গণেশ বিষ্ণু শক্তি। বিষ্ণু হলেন মুক্তিদাতা। এজন্য গণেশের পূজার্চনায় মুক্তিলাভ হয় I মুক্তি অর্থে এখানে অষ্টপাশের বন্ধন থেকে অব্যাহতি লাভ বোঝায়। এই পাশরূপ রজ্জু কাটতে ইঁদুরের মত আর কেউ নেই। দুই তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে ইঁদুর অতি শক্ত দড়িও কেটে ফেলতে পারে। আবার যিনি মোক্ষ (মুক্তি) লাভে ইচ্ছুক তারও দুটি দাঁত আছে - বিবেক এবং বৈরাগ্য। এই দুই দাঁতের সাহায্যে অষ্টপাশ ছেদন করতে পারলেই মুক্তিলাভ সম্ভব।

৪. শ্রী শ্রী সরস্বতী
দেবী সরস্বতী হলেন মা দুর্গার জ্ঞানশক্তি। তিনি বাণীরূপিণী বাগ্দেবতা। দেবীর হাতে পুস্তক ও বীনা। পুস্তক হল বেদরূপী শব্দব্রহ্ম। বীনা সুর এবং ছন্দের প্রতীক - নাদব্রহ্ম। শুদ্ধ সত্ত্বজ্ঞানের ধারক এবং বাহক বলে দেবী সর্বাঙ্গে শুক্লবর্ণা। জ্ঞানের সাধক হতে হলে যে কাউকে শুদ্ধ-সত্ত্বময় হতে হবে। বিশেষ ধরণের সরস্বতীর বাহন সাদা বর্ণের হাঁস। জল এবং দুধ মিশ্রিত করে এই ধরণের হাঁসকে খেতে দিলে সে বিশেষ প্রক্রিয়ায় জলটুকু রেখে শুধুমাত্র দুধটুকু খেয়ে নিতে পারে। এর তাৎপর্য্য হল জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানের পথে অসার বস্তুসমূহ ত্যাগ করে বা এড়িয়ে গিয়ে শুধুমাত্র সারবস্তু গ্রহণ করে।

হাঁস জলে থাকে। অথচ আশ্চর্য্য জল তার গায়ে লেগে থাকেনা। এর তৎপর্য্য হল পরমহংস স্তরের মানুষ সংসারে বাস করলে এখানকার কোন কাঁদা বা সাংসারিক মোহ তাঁকে আকৃষ্ট এবং প্রভাবিত করতে পারে না।

৫. শ্রী শ্রী কার্ত্তিক
কার্ত্তিক হলেন গৌরি এবং মহাদেবের সন্তান। দক্ষ যজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের পর শিব ছিলেন সতীর ধ্যানে নিমগ্ন। আবার সতী উমারূপে হিমাচলে জন্মগ্রহণ করে পতির জন্য তপস্যা করেছেন দীর্ঘকাল। পার্ব্বতীর কঠোর তপস্যায় একসময় শিবের ধ্যান ভাঙ্গে।

এদিকে তারকাসুরের অত্যাচারে দেবতারা স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হয়। তারা তখন নিজেদের পক্ষে একজন সেনাপতির খোঁজ করছিলেন। আর অন্যদিকে হর-পার্ব্বতীর তপস্যার সন্তান হিসেবে জন্ম হল কার্ত্তিকের I তাকেই দেবতারা নিজেদের সেনাপতি হিসেবে বরণ করে।

কার্ত্তিক ক্ষাত্রশক্তির প্রতীক। তার নেতৃত্বে দেবতারা তারকাসুরকে যুদ্ধে নিহত করতে সক্ষম হয়।

কার্ত্তিক পুত্রদাতা। সুন্দর এবং বীর পুত্রলাভের জন্য ভক্তরা তাঁর ব্রত করে যা মূলত কার্ত্তিক ব্রত হিসেবে পরিচিত। কার্ত্তিকের বাহন হল ময়ূর। নিজে পরম সুন্দর বলে বাহন হিসেবে সুন্দর প্রাণী ময়ূরকে বেছে নিয়েছেন। ময়ূর তার পেখমকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে সাপকে নিজের নখ এবং তীক্ষ্ণ ঠোঁট দ্বারা হত্যা করে। তাই কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর সমাজে ধ্বংসকারী বিষ ছড়ায় এমন সব লোকদেরকে দমন করার ইঙ্গিত দেয়।

৬. সিংহ
সিংহ শব্দটি হিংস ধাতু থেকে উৎপন্ন। যে হিংসা করে সেই সিংহ। হিংসার উৎপত্তি হয় রজঃ গুন থেকে।

মা দুর্গা হলেন শুদ্ধ সত্ত্বগুণময়ী। অসুর হল ঘোর তমঃ গুণ সম্পন্ন। মায়ের সাথে অসুরের লড়াই হল সত্ত্ব এবং তমগুনের মধ্যেকার লড়াই। এই লড়াইয়ে তারই জয় হওয়ার কথা যার পক্ষে থাকবে রজঃ গুন। তাই অসুরের সাথে যুদ্ধে জিতবার অন্যতম সহায়ক হিসেবে মা দুর্গা তাই সিংহকে নিজের বাহন হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

মহিষাসুরের সাথে যুদ্ধের সময় সিংহের নখ, দাঁত এবং গর্জন দেবীর সহায়ক শক্তি হিসেবেই নিশ্চিতভাবে কাজ করে।

৭. অসুর
অসুর শব্দের অর্থ হল সুর-বিরোধী। অর্থাৎ যে বা যারা সুর তথা দেববিরোধী তারাই মূলত অসুর। অসুর-এর মধ্যে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য থাকলেও সে এই শক্তিকে সে অসৎ পথে এবং কাজে ব্যবহার করে।

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অজ্ঞানতা - এসব হল আসুরিক সম্পদ। গীতায় ভগবান কৃষ্ণ এসব বৈশিষ্টই অসুরের ক্ষেত্রে নির্দেশ করেছেন। মা দুর্গা অসুরের ঐসব শক্তিকে শুভ পথে আনার জন্য চেষ্টা করেন। কারণ অসুর হলেও সেও মায়েরই সন্তান। তিনি অসুরকে যে আঘাত করেন তা এর মঙ্গলের জন্যই। জগৎ জননীর পাদ স্পর্শে অসুরের বহুজন্মের পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়।

অসুর অবিদ্যার প্রতীক। পরাবিদ্যা রূপিণী মা অসুররূপ অবিদ্যাকে বিনাশ করে সাধকের মহামুক্তি নিশ্চিত করেন। সাধারণ মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট, ভয়ভীতি, আপদ-বিপদ - সকলই আসুরিক শক্তির কাজ। পরম করুণাময়ী মা দুর্গা নিরন্তর অসুর বিনাশ করে সন্তানের কল্যাণ বিধান করছেন।

৮. কলাবৌ (নবপত্রিকা)
কলাবৌ-এর শাস্ত্রীয় নাম হল নবপত্রিকা। নবপত্রিকা বলতে মূলত নয়টি গাছের চারার সমন্বিত রূপ / কাঠামো বোঝায়। নয়টি গাছ হল কলাগাছ, কচুগাছ, হলুদগাছ, জয়ন্তী, চালতা, বেল, অশোক ও মানকচু এবং ধান গাছ। সমষ্টিগত ভাবে মা দুর্গার প্রতিভু হিসেবে এদের অর্চনা করা হয়।

প্রতিটি গাছের / চারার একজন করে অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন। যেমন কলাগাছে আছেন ব্রহ্মাণী। কচুতে কালিকা, হলুদে দুর্গা, জয়ন্তীতে কার্তিক, বেলে শিবা, চালতায় (দাড়িম্ব) রক্তদন্তিকা, আবার অশোকে আছেন দেবী শোকরহিতা, মানকচুতে আছেন চামুন্ডা এবং ধানে রয়েছেন লক্ষ্মী।

উপরোক্ত বিভিন্ন শক্তির মধ্যে কেউ পালনী, কেউ সৃজনী এবং কেউবা ধ্বংসের প্রতীক বলা যায়। মা দুর্গার সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কাজ এসব শক্তির মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়।